ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2310-2316
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.494

বাণী বসুর মহাভারত-সিরিজের উপন্যাসে প্রকৃতি চেতনা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাণজিৎ সরকার, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 20.07.2026; Accepted: 28.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Mahabharata has been enriching Bengali literature in various ways for ages. There is an eternal quality within the tale of the Mahabharata that attracts writers of every era. In the novels belonging to her Mahabharata series, novelist Bani Basu has not only reconstructed the narrative of the Mahabharata but has also crafted the characters from the perspective of the modern era. In this reconstruction, she has prioritized modern logic and scientific consciousness.Beyond reconstructing the narrative and characterization, Bani Basu's novels also portray a devastated picture of modern social life. To reflect this image, she highlights the destructive nature of civilization beneath the backdrop of nature in the Mahabharata. In portraying this aspect, she gives importance to modern logic and contemporary circumstances. She demonstrates how, in the era of globalization, human beings continuously destroy nature to satisfy their greed. In this drive to bring nature under human control, nature's pure essence is being destroyed. In Bani Basu's novels, behind the characters 'Ganga' and 'Kalindi', the pure, flowing form of rivers is depicted, alongside a description of how rivers are losing their true identity at the hands of modern civilization. Furthermore, as an indication of the destruction of forests in the present era, she narrates the story of the burning of the 'Khandava Forest'. In discussing these aspects of environmental consciousness within the Mahabharata narrative, Bani Basu prioritizes modern reasoning. The essay titled "Environmental Consciousness in Bani Basu's Mahabharata Series Novels" will present a research-oriented discussion on these subjects.

Keywords: Reconstruction, Environment, Mahabharata, River, Forest

মহাভারতে একটি বিশাল যুগের সমাজ ও জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মহাভারতের এই সুবিশাল কাহিনিকে পুরাণের আকর গ্রন্থ হিসেবেও স্বীকার করে নেওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন মহাভারতে "যুগান্তকারী ভারতপুরাণ সঞ্চিত আছে।"[১] মহাভারতে বলা হয়েছে—

> "ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ
> যদি হাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তিন কৃত্রচিৎ।।"[২]

অর্থাৎ,

> "ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিবিষয়ে এই মহাভারতে যাহা আছে, তাহা অন্য স্থানেও আছে, যাহা ইহাতে নাই, তাহা কোথাও নাই।" [৩]

আমরা বুঝতে পারি যে ভারতীয় জীবনপ্রণালীতে এমন কিছু নেই যা মহাভারতে অনুপস্থিত। অধ্যাপক সুকুমার সেনও প্রায় একই সুরে বলেছেন—

> "মহাভারত ভারতীয় সাহিত্যের ও সংস্কৃতির এনসাইক্লোপীডিয়া। আখ্যান-আখ্যায়িকা-কাব্য-গাথা-স্তব নীতিকথা, সাধারণজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, ধর্মচিন্তা, আধ্যাত্মভাবনা সবকিছু এখানে উপস্থাপিত।"[৪]

এছাড়া শ্রীঅরবিন্দ মহাভারত সম্পর্কে বলেছেন—

> "ইহা একটি সার্থক গল্প, একখানি ইতিহাস, সর্বাংশে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রগত ভাব ও আদর্শরাজির প্রতিনিধি।"[৫]

মহাভারতের এই সুবিশাল পুরাণকাহিনি বহু সময় ধরে এযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে আসছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

> "এই যুগের বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতিনিধিরূপে দুইখানি বৃহৎ মহাকাব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার একখানি মহাভারত যাহার বিশাল আয়তনের মধ্যে ভারতীয় মনের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী রচিত কবিতার অংশ সংগৃহীত হইয়াছে আর একখানি রামায়ণ।"[৬]

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী মহাভারতের কাহিনিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন সময় লেখক ও শিল্পীরা নতুন নতুন সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে এই মহাভারতীয় কাহিনির অনায়াস বিচরণ লক্ষ করা যায়। বাংলা উপন্যাসের জগতেও মহাভারতীয় কাহিনি কখনও অনুষঙ্গ হিসেবে বা কখনও সরাসরি সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মহাভারতের পুরাণ কাহিনিচর্চার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার পাশাপাশি উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে বর্তমানের জীবনযাত্রা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সংযোগ সূত্র স্থাপন করেছেন।

বাণী বসুর মহাভারত সিরিজের উপন্যাসগুলিতে মহাভারত-কাহিনির অলৌকিকতাগুলোকে বর্জন করে এবং মহাভারতের কাহিনিকে আধুনিক ভাবধারায় সম্মিলিত করে তিনি মহাভারতের পুনর্নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসগুলিতে কাহিনির পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে চরিত্রগত পুনর্নির্মাণ এবং বর্তমান সমাজজীবন ভাবনা। বাণী বসুর উপন্যাসের কাহিনিগুলো আধুনিক হয়ে ওঠার পেছনে এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে বাণী বসুর প্রকৃতি চেতনার অভিনবত্ব। মহাভারত সিরিজের উপন্যাসগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় উপন্যাসের বিভিন্ন ছত্রে একদিকে যেমন নিছক প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে; আবার কোথাও এই প্রকৃতি হয়ে উঠেছে রূপক মাত্র। ভারতবর্ষের নানান পৌরাণিক গ্রন্থে দেব দেবীর নানান বর্ণনা থাকলেও সেখানে প্রকৃতি এক জীবন্ত ভূমিকা পালন করেছে। জগত-জীবনের ওপর প্রকৃতির অবদানের জন্য মানুষ প্রকৃতিকে দেবতারূপে পুজো করেছে। অর্থাৎ দেখা যায় নদী, গাছ, বায়ু ইত্যাদি নিছক প্রকৃতির উপাদান হয়ে থাকেনি; তা হয়ে মানুষের ভাবনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনেক সময় প্রকৃতির উপাদানকে নারী এবং পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "As in many archaic mythological concepts, the four basic elements are represented in the Indian mythology as either male or female: air (wind) and fire are male principles, later personified as male deities – Agni and Vāyu; earth and water (river) are female."[৭]

বাণী বসু উপন্যাসে প্রকৃতি চিত্রের বর্ণনা এবং প্রকৃতি চিত্রের অন্তরালে ব্যঞ্জনাধর্মী প্রসঙ্গের পাশাপাশি লেখিকা প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের সংঘাতের ছবিটি আধুনিক চিন্তা ধারায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বায়নের যুগে

প্রাচীনকালের তপোবনের ন্যায় প্রকৃতির অবস্থান পৃথিবীর বুকে প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নগর সভ্যতার বিকাশে মানুষ প্রথম আঘাত হানে প্রকৃতির বুকে। প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতাকে নিজের হাতের মুঠিতে নিয়ে আসবার জন্য আধুনিক মানুষ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিকতার প্রভাবে প্রকৃতির বিশেষ অঙ্গ নদী যেমন তার প্রবহমানতা হারিয়েছে তেমনি বনজঙ্গল তার অস্তিত্ব খুইয়ে বসেছে। প্রাচীন যুগে পৃথিবীর বুকে জনসংখ্যা কম থাকায় প্রকৃতির ওপর অনুরূপ বিধ্বংসী আঘাত নেমে আসেনি কিন্তু বর্তমান যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকৃতির সম্পদকে মানুষ ইচ্ছে মত ব্যবহার করায় প্রবৃত্ত হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> "প্রকৃতির সম্পদ প্রয়োজন মেটানোর জন্য, লুণ্ঠনের জন্য নয়—অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বলিয়ান হয়ে একশ্রেণির মানুষ প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে চলেছে। তৃষ্ণার জল, বাতাস মাটি সবই এখন মুনাফা লাভের উপাদান। উন্নয়ন নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু উন্নয়নের সাথে যে সমতার প্রশ্ন তাকে আমরা ভুলতে বসেছি।"[৮]

প্রকৃতির সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন সময়ে একশ্রেণির মানুষ আন্দোলন করেছেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য সরকার কর্তৃক নানান আইন-কানুন প্রচলিত হলেও প্রাকৃতিক সম্পদ আজ বিনষ্টির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একজন সামাজিক দায়িত্বশীল সাহিত্যিকের ন্যায় বাণী বসু তাঁর মহাভারত-আশ্রিত উপন্যাসগুলিতে প্রকৃতির এই সংকটের ছবিকে পৌরাণিক কাহিনির অন্তরালে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছেন।

বাণী বসুর 'কালিন্দী' উপন্যাসে দেখা যায় মহারাজা শান্তনু যুবক বয়সে গঙ্গা নাম্নী এক নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। মহাভারতের কাহিনিতে এই গঙ্গাকে আমরা পৌরাণিক দেবী হিসেবেই জানি। মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী বশিষ্ঠের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য অষ্টবসু ও তাঁর স্ত্রীরা গঙ্গার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। বশিষ্ঠ অষ্টবসুকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দিয়েছিলেন। মহাভারতে রয়েছে—

> "বশিষ্ঠ আমাদের শাপ দিয়েছেন— তোমরা নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। আমরা মানুষীর গর্ভে যেতে চাই না, আপনি আমাদের পুত্ররূপে প্রসব করুন, প্রতীপের পুত্র শান্তনু আমাদের পিতা হবেন, জন্মের পরেই আপনি আমাদের জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শীঘ্র নিষ্কৃতি পাই।"[৯]

সেই অনুযায়ী অষ্ট বসু গঙ্গার কাছে অনুরোধ করেছিলেন গঙ্গার গর্ভে মর্তে জন্মগ্রহণ করবার পরেই দ্রুত যেন তাঁদের মুক্তি ঘটে। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী এই অনুরোধ রক্ষার্থেই গঙ্গা শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এই শর্তে যে শান্তনু গঙ্গার কোন কর্মের প্রতিবাদ করতে পারবেন না। ঠিক তেমনি শান্তনু গঙ্গার কোন কাজের প্রতিবাদ করেননি ফলস্বরূপ প্রথম সাতটি সন্তান গঙ্গা বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টবসুর অপরাধ একটু বেশি থাকায় তিনি দীর্ঘদিন মানব জীবন যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। বাণী বসু 'কালিন্দী' উপন্যাসের কাহিনিতে এই পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে এক ভিন্ন ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে গঙ্গা হয়ে উঠেছেন আদিম প্রবহমান প্রকৃতির এক রূপ। প্রকৃতিকে যেমন মানুষের তৈরি কৃত্রিম নিয়ম-কানুনে বা নিজ স্বার্থ রক্ষায় বেঁধে রাখা যায় না; তেমনি উপন্যাসে গঙ্গাও হয়ে উঠেছেন একজন স্বাধীনচেতা রমণী। উপন্যাসে গঙ্গার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "গঙ্গা হিমালয় অঞ্চলের স্বাধীন রমণী! উত্তরের তুষারভূমি, সেখানে সমতলের মানুষ পৌঁছতে পারে না। সে রাজ্যে নরনারীর জীবন পদ্ধতি আলাদা রকম। সেখানে পুরুষরা বেঁধে রাখেনি নারীদের। তারা যথেচ্ছ বিহার করে। শান্তনু কী করে জানবেন, গঙ্গার পক্ষে মর্ত্যভূমির নিয়ম কানুন, সমাজ সংস্কার মেনে নেওয়া কঠিন। তাই-ই তিনি একটা সীমা বেঁধে দেন।"[১০]

উপন্যাসে গঙ্গা হয়ে উঠেছেন প্রকৃতির এক বিশুদ্ধ রূপ। উপন্যাসে দেখা যায় মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হলেও তিনি আজীবন গঙ্গার সঙ্গে সংসার যাপন করতে পারেননি। এমনকি শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভজাত প্রথম চারটি সন্তান মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং অন্য তিনটি সন্তান রুগ্ন, ক্ষীণপ্রাণ হয়ে জন্মায়। গঙ্গা বুঝতে পেরেছিলেন এই তিনটি সন্তান হিমালয়ের তুষারভূমিতে জীবনধারণ করতে পারবে না। তাই তিনি সন্তানগুলিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। একমাত্র অষ্টম পুত্র সুলক্ষণযুক্ত ও স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই গঙ্গা অষ্টম পুত্রটিকে শান্তনুর কাছে ফিরিয়ে দেন। পরবর্তীতে গঙ্গা শান্তনুকে ত্যাগ করেন। এই অষ্টমপুত্রটি ছিলেন দেবব্রত ভীষ্ম। মহাভারতের এমনকি বাণী বসুর মহাভারত সিরিজের উপন্যাসগুলিতেও দেখা যায় ভীষ্ম চরিত্রটি আজীবন নানান মানসিক দ্বন্দ্ব, হতাশা, ক্লান্তিতে কাটিয়েছেন। নিজের প্রতিজ্ঞার রক্ষা এবং রাজপুরীর দায়িত্ব পালন করতে করতে ভীষ্মের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কিছুর জলাঞ্জলি হয়েছে। ফলে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে একটি আদ্যপান্ত ট্র্যাজিক চরিত্র। উপন্যাসে দেখা যায় পার্বত্য তুষারভূমির এই গঙ্গা নাম্নী নারীর সঙ্গে শান্তনুর দাম্পত্য জীবন সুখকর হয়ে ওঠেনি এবং শান্তনু গঙ্গাকে সংসার জীবনে আবদ্ধ করতে পারেননি। শান্তনু গঙ্গার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের সংসার জীবনের একটি সুখকর পরিণতি টানার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়ে ওঠেনি। প্রথম সাতটি সন্তান সন্তানের মৃত্যু এবং অষ্টম পুত্রটির আজীবন যন্ত্রনা গঙ্গা ও শান্তনুর মিলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

গঙ্গা বাণী বসুর উপন্যাসে শুদ্ধ প্রবহমান প্রকৃতির প্রতিরূপক হয়ে উপস্থাপিত হয়েছেন। শান্তনু হয়ে উঠেছেন বিশ্বায়নের যুগের এবং আধুনিক সভ্যতার একজন নাগরিক মানুষ। যখনই এই নাগরিক মানুষ নিজের চাহিদার তাগিদে প্রকৃতিকে নিজের করায়ত্ব করতে চেয়েছে তখনই তার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। শান্তনু শুদ্ধ প্রকৃতির রূপ গঙ্গাকে নানান বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন কিন্তু এর পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। তার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা শান্তনুর আটটি সন্তানের জীবনের করুণ পরিণতি থেকে বুঝতে পারি। গঙ্গাও তাঁর শুদ্ধতা বজায় রেখে আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বর্তমান যুগেও দেখা যায় প্রকৃতির একটি অন্যতম অঙ্গ নদীকে মানুষ নানান কৃত্রিম উপায়ে ব্যবহার করে থাকে। নদীর প্রবাহমানতাকে আটকে দিয়ে নদীর ওপর বৃহৎ আকারের কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ফলস্বরূপ নদীর আপন বৈশিষ্ট্য যেমন বিলীন হয়; তেমনি বাঁধ তৈরির পার্শ্ববর্তী এলাকা নানান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাবন্ধিক নদীর উপর আধুনিক মানুষের এই আগ্রাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> “বর্তমানে বহুমাত্রিক প্রয়োজনে বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। জলাধার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সেচ ব্যবস্থা নদীর নাব্যতা রক্ষা, ইত্যাদি বহুবিধ পরিকল্পনা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে করা হয়। জলাধরগুলি উচ্চতর অববাহিকায় হবার ফলে বনাঞ্চলের বড় অংশ ধ্বংস হয়। সেই এলাকার জনজীবন এবং পশু-পাখি উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। বনাঞ্চল ধ্বংস হবার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কিছু পরিবর্তন ঘটে। বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে। ভূমিক্ষয়ও বাড়তে থাকে। ফলে নদীর গতির কিছুটা ক্ষয় হয়।”[১১]

অর্থাৎ দেখা গেল মানুষ চাহিদা মেটানোর জন্য নদীকে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করলে নদী তার বিশুদ্ধ রূপ হারিয়ে ফেলে। এমনকি বর্তমান যুগের মানুষের দ্বারা নদীর জল নানান ভাবে দূষিত হয়ে থাকে। তাই উপন্যাসে দেখা যায় গঙ্গা মানুষের তৈরি নিয়ম কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ সংসারে নিজেকে সমর্পণ করে দেননি। যখনই শান্তনু জোর করে গঙ্গাকে সংসার জীবনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন তখনই তার ফল হয়েছে ভয়াবহ। তাই গঙ্গা নিজের শুদ্ধ রূপ বজায় রেখে শান্তনুকে পরিত্যাগ করেছেন। বাণী বসুর মহাভারত সিরিজের একটি অন্যতম উপন্যাস

'কালিন্দী'তে গঙ্গা ও শান্তনুর এই প্রণয়ের কাহিনি আধুনিক যুগের প্রকৃতি এবং কৃত্রিম নাগরিক সভ্যতার সম্পর্ককে সূচিত করেছে।

বাণী বসুর মহাভারত সিরিজের আরেকটি অন্যতম চরিত্র সত্যবতীর (কালিন্দী) জীবন কাহিনিও নদীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে। বাণী বসুর উপন্যাসে দেখা যায় সত্যবতী যখন জেলে পরিবারে প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবন অতিবাহিত কড়েছেন তখন তাঁর নাম ছিল কালিন্দী। কালিন্দী শব্দের অর্থ যমুনা নদী। সত্যবতীর পতিগৃহে জীবন নদীর মতই স্বচ্ছ এবং প্রবাহমান গতিতে বয়ে চলেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে পরাশরের সংসর্গে এবং কৃত্রিম সুগন্ধ শরীরে লেপন করার পর কালিন্দী তাঁর বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে তাঁর নাম কালিন্দী থেকে হয়ে যায় সত্যবতী। আর এই সত্যবতীর প্রেমে পড়েছিলেন আধুনিক নগর সভ্যতার মানুষের প্রতীকী চরিত্র শান্তনু। শান্তনু যখন সত্যবতীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন তখন সত্যবতী তাঁর বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে কৃত্রিম চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ নদীকে যখন বলপূর্বক তার গতিপথ পরিবর্তন করানো হয় এবং বিশ্বায়নের যুগের মানুষ তাকে নিজ কর্মে ব্যবহার করে তখন সে তার বিশুদ্ধরূপ হারিয়ে ফেলে। শহরাঞ্চলে নদীর দূষণ, নদীর জলস্তর কমে যাওয়া নদীর এই কৃত্রিম রূপের চূড়ান্ত উদাহরণ। তেমনি বাণী বসুর উপন্যাসে দেখা যায় রাজনৈতিক চক্রান্তের বলি করে কালিন্দীকে শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই মানসিক বলপূর্বক বিবাহের পরিণতি খুব সুখকর হয়ে ওঠেনি। ফলে সত্যবতী যেমন তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা হারিয়ে এক কুটিল রাজনীতিবিদ রাজরানিতে পরিণত হয়েছিলেন; তেমনি সত্যবতীর সন্তান বিচিত্রবীর্য এবং চিত্রাঙ্গদের অকাল মৃত্যুতে সত্যবতীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রকৃতিতে যেমন দেখা যায় নদী নানান বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেও সব সময় প্রকৃতির ওপর নিজের অবদান ছেড়ে যায়; তেমনি সত্যবতী হস্তিনাপুর সাম্রাজ্যের উপর তাঁর অবদান ছেড়ে গিয়েছেন। নদীর স্পর্শে যেমন মাটি উর্বর হয়ে ওঠে এবং সেখানে জীবনধারণের উপযোগী শস্য উৎপন্ন হয়; তেমনি উপন্যাসে দেখা যায় সত্যবতী এবং পরাশরের মিলনজাত সন্তান বেদব্যাসের ঔরসে হস্তিনাপুর সাম্রাজ্য ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসে দেখা যায় শান্তনু সত্যবতীকে সংসার জীবনে আবদ্ধ করায় হস্তিনাপুর সাম্রাজ্যে সংকট নেমে এসেছিল এবং পাশাপাশি সত্যবতীর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। তাই দেখা যায় শান্তনু মৃত্যুকালীন সময়ে সত্যবতীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় বিষয় মৃত্যুকালীন সময়ে শান্তনু তাঁর স্ত্রীকে সত্যবতী নামে সম্বোধন করেননি; তিনি সম্মোধন করেছিলেন কালিন্দী নামে। উপন্যাসে রয়েছে—

> "তিনি হঠাৎ হাত দুটি জোড় করেন। বলেন— কালিন্দী আমি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করো।"[১২]

অর্থাৎ এখানে দেখা যায় শান্তনু সত্যবতীর পূর্বের বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক নির্ভেজাল রূপকে মৃত্যুকালীন সময়ে স্মরণ করেছেন।

মহাভারত সিরিজের উপন্যাসগুলোতে চরিত্রের অন্তরালে প্রকৃতির রূপ যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের সংঘাতের এক চরম পরিণতির ছবি ফুটে উঠেছে খাণ্ডবদাহন প্রসঙ্গে। পঞ্চপাণ্ডব বসতভূমি এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য খাণ্ডব অরণ্যকে বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে দাবানল হওয়ায় জঙ্গল এবং জঙ্গলের প্রাণীরা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলস্বরূপ জঙ্গল পরিণত হয় উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং সে উন্মুক্ত প্রান্তরে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু বাণী বসুর উপন্যাসে খাণ্ডবদাহনের ঘটনা নিছক প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্ঘটনা হয়ে থাকেনি; তা হয়ে উঠেছে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের পরিকল্পনার রূপান্তর। তাই উপন্যাসে দেখা যায় খাণ্ডবদাহনে সমস্ত গাছপালা, পশুপাখি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর উৎসাহে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

> "কৃষ্ণ এক গাল হেসে বললেন— পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখো পার্থ, যোজনের পর যোজন, যোজনের পর যোজন এই খাণ্ডববন এখন অগ্নিদেবের কৃপায় ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্গত হয়ে গেল। এখানে ক্ষেত চষবে, প্রজা বসবে, এক পরিকল্পিত সুন্দর মহানগরী তৈরি হবে।"[১৩]

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মানুষের বাসস্থানের জায়গার প্রয়োজন পড়েছে এবং জীবন ধারণ ও অর্থ উপার্জনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত অরণ্য ধ্বংস করা হচ্ছে। বিশেষ করে শিল্পের অগ্রগতির জন্য একদিকে যেমন দূষণ বাড়ছে তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজনীয় জায়গার তাগিদে ধ্বংস হচ্ছে অরণ্য। পরিবেশবিদের মতে—

> "মানুষ আজ যেন ভাইরাসের মত বংশবিস্তার করে চলেছে। মানুষের জন্যই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বহুল পরিমাণে। অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্র বানাচ্ছে, বনের সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে নির্বিচারে হত্যা করছে বাঘ-সিংহকে, মাংসের লোভে অপ্রয়োজন সত্ত্বেও নৃশংসভাবে সংহার করে চলেছে মৃগকুলকে।"[১৪]

তবে আধুনিক যুগে এই অরণ্য ধ্বংস নিয়ে পরিবেশবিদেরা নানান ভাবে প্রতিবাদ করেছেন। ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের বুকে অরণ্য রক্ষার তাগিদে নানান আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। পরিবেশবিদেরা মনে করেছেন মানুষকে পরিবেশের সমতা বজায় রেখে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র উন্নয়নের তাগিদে পরিবেশ ধ্বংস করা কোনভাবেই কাম্য নয়। বাণী বসু তাঁর উপন্যাসে খাণ্ডব দাহনের প্রসঙ্গটিকে নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা না বলে এর একটি রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর অরণ্য ধ্বংসের পশ্চাতের এই রাজনীতিকরন বর্তমান যুগের একশ্রেণির পরিবেশ ধ্বংসকারী মানুষের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। সমালোচক মহাভারতের এই খাণ্ডব দহন এবং বর্তমান যুগের উন্নয়নের গতিপথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> "উন্নয়নের দর্প লেখায় ঢাকা পড়ে সাবেক আকাশ। সেভাবেই ইন্দ্রপ্রস্থের পাশে খাণ্ডবপ্রস্থে আর জঙ্গল থাকবে না, জঙ্গলভজীবন থাকবে না—হবে নগরায়ন। আধুনিক ভারতে সাতের দশকে তৎকালীন উত্তরপ্রদেশে চিপকো আন্দোলন প্রশ্ন তুলেছিল উন্নয়নের গতিপথ নিয়ে।"[১৫]

এইভাবে আলোচনা করে দেখা গেল বাণী বসুর মহাভারত-আশ্রিত উপন্যাসের প্রকৃতির রূপ বর্ণনা নিছক একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। কখনো তা হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাধর্মী এবং কখনো সরাসরি লেখিকা প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের সংঘাতের ছবিটি তুলে ধরেছেন। আর এই ছবি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক যুক্তিবোধ এবং বর্তমান যুগ মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলস্বরূপ বাণী বসুর উপন্যাসের মহাভারতের প্রকৃতি চিত্রন হয়ে উঠেছে আধুনিক সময়োপযোগী। এছাড়াও বাণী বসু মহাভারত কাহিনি নির্ভর এই মহাভারত সিরিজের 'কৃষ্ণ বাসুদেব' উপন্যাসে পরিবেশ দূষণের নির্মম ছবিকে আধুনিক বিজ্ঞান চেতনায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মহাভারতের কাহিনি অনুযায়ী গান্ধারীর অভিশাপে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। বাণী বসুর 'কৃষ্ণ বাসুদেব' উপন্যাসে লেখিকা দ্বারকাপুরী ধ্বংসের পেছনে নানান যুক্তিযুক্ত কারণ উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায় দ্বারকাপুরীর শাসকবর্গ এবং প্রজা সাধারণ মানুষ যখন নানান অন্যায় এবং অনৈতিক জীবনযাপনে লিপ্ত হন তখন তাদের জীবনে নানান রকম অশান্তি নেমে আসে। তারা একদিকে যেমন মানসিক ভাবে অধঃপতিত হন তার পাশাপাশি হিংসার বশবর্তী হয়ে নানান গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। আর দ্বারকাপুরীর মানুষদের এই জীবনযাপন, মানসিক ভাবধারার প্রভাব সরাসরি পড়েছে পরিবেশের উপর। আধুনিক যুগেও দেখা যায় এই ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং মানসিকভাবে অধঃপতিত মানুষরাই নানানভাবে পরিবেশ দূষিত করে থাকেন। যেমন রাস্তায় আবর্জনা ফেলা, জলদূষণ করা ইত্যাদি কর্মগুলো আধুনিক যুগের অশিষ্টাচারী মানুষেরাই করে থাকেন। বাণী বসুর 'কৃষ্ণ বাসুদেব' উপন্যাসে দ্বারকাপুরীর মানুষেরা

ঠিক এই কর্মেই নিযুক্ত হয়েছেন। উপন্যাসে দ্বারকাপুরীর পরিবেশের কদর্যরূপ দেখে কৃষ্ণ প্রতিবাদ করে যখন বলেন—

> "এত নোংরা করে রেখেছেন দোকান! এখান থেকে তো দূষণ ছড়াবে, ছি।"[১৬]

তবে উপন্যাসে কৃষ্ণ একজন আধুনিক প্রতিবাদী যুবকের ন্যায় শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি; দ্বারকাপুরীর জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং পরিবেশ দূষণজাত রোগ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেছেন। তিনি আদেশ করে বলেছেন—

> "আমি মুখে মুখে এখন নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি। শিগগিরই আদেশ জারি করব। এক সপ্তাহ সময় দিলাম, এই গলি, আপণ সব পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য করে ফেল।"[১৭]

বাণী বসু এখানে একজন দায়িত্বশীল লেখকের ন্যায় কৃষ্ণের বাচনিক পাঠককে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তির উপায় বাতলে দিয়েছেন। তাই দেখা গেল বাণী বসু তাঁর মহাভারত সিরিজের উপন্যাসে পরিবেশের অন্তরালের ব্যঞ্জনাধর্মী দিক, পরিবেশ ও মানুষের সংঘাতকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন; তেমনি পরিবেশের ওপর আসা মানুষের কৃত্রিম আঘাতকেও তিনি সমালোচনা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বুদ্ধদেব। মহাভারতের কথা। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ. ৩২।
২. ভট্টাচার্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ অনুবাদ। মহাভারতম্ (শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস প্রণীতম), স্বর্গারোহন পর্ব্ব, ৫/৪৯, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪২২, কলকাতা, পৃ. ৪২।
৩. তদেব, পৃ. ৪২।
৪. সেন, সুকুমার সেন। ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৮, কলকাতা, পৃ-৭৯
৫. শ্রী অরবিন্দ। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, ১৯৫৯, কলকাতা, পৃ-৩৪৫
৬. তদেব, পৃ. ৩৪২।
৭. Blanka Knotkova-Capkova। Symbols of Water and Woman on Selected Examples of Modern Bengali Literature in the Context of Mythological Tradition। Wagadu: A Journal of Transnational Women's & Gender Studies, https://digitalcommons.cortland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1098&context=wagadu, প্রবেশের তারিখ ২০ জুলাই ২০২৬
৮. চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত সম্পাদনা। পরিকথা। একবিংশতি বর্ষ, মে ২০১৯, সাউথ গড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, নিবেদন অংশ।
৯. বসু, রাজশেখর সারানুবাদ। মহাভারত। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৪২২, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
১০. বসু, বাণী। কালিন্দী। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৮।
১১. রায়, মোহিত সম্পাদনা। পরিবেশ চর্চা: ইতিহাস ও বিবর্তন। অনুস্টুপ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১৮৩।
১২. বসু, বাণী। কালিন্দী। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১১০।
১৩. বসু, বাণী। পাঞ্চাল কন্যা কৃষ্ণা। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ১২৯।
১৪. পাত্র, সুধাংশু। বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ১৫।
১৫. আচার্য, দেবীদাস। মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান। সিগনেট প্রেস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩১।
১৬. বসু, বাণী। কৃষ্ণ বাসুদেব। দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৫৪৪।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৪৫।